بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৮ অক্টোবর, ২০২৪ মোতাবেক ১৮ ইখা, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আগামীকাল যুক্তরাজ্য জামা'ত ফযল মসজিদের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে যেখানে অ-আহমদী অতিথি ও প্রতিবেশীদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ফযল মসজিদের একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে কেননা এটি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম মসজিদ যা খ্রিষ্টানদের দুর্গে বানানো হয়েছিল। এরপর এখান থেকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং এর প্রচার মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে আরম্ভ করা হয়। আজ আমাদের বিরোধীরা আমাদেরকে বলে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খ্রিষ্টানদের হাতে রোপিত বৃক্ষ, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এই বৃক্ষের মাধ্যমে তাদের অর্থাৎ পাশ্চাত্যে বসবাসকারী লোকদের ধর্মীয় দুর্বলতা তাদের দেশেই প্রকাশ করে ইসলামের অনিন্দ্য-সুন্দর শিক্ষা প্রচার করা হচ্ছে। এই আপত্তিকারীদের এভাবে তবলীগি কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য হয় নি। তবে ফযল মসজিদ নির্মাণের পূর্বে ওকিং-এ একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল এবং এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ **জি ডাবলিউ লাইটনার,** যিনি লাহোরে ওরিয়েন্টাল কলেজের প্রিন্সিপাল পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে যুক্তরাজ্যে ফেরত আসেন আর ১৮৮৯ সালে ওকিং অঞ্চলে একটি মসজিদ নির্মাণ করান। কাকতালীয়ভাবে এটিই সেই বছর যখন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভীত রচিত হয়েছিল এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ মসীহ্ মওউদ (আ.) আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সূচনা করেছিলেন। এই প্রখ্যাত অধ্যাপক সাহেব প্রাচ্যের জ্ঞান সংক্রান্ত একটি প্রতিষ্ঠানও এর সাথে নির্মাণ করেন যেন মুসলমানরা ধর্মীয় জ্ঞানও অর্জন করতে পারে এবং নিজেদের ইবাদতও করতে পারে। এই মসজিদ নির্মাণের পুরো ব্যয়ভারের একটি বড়ো অংশ ভূপালের শাসক বেগম শাহজাহান দিয়েছিলেন আর তার নামেই এই মসজিদের নামকরণ করা হয়েছিল। যাহোক সেই অধ্যাপক সাহেব ১৮৯৯ সালে মৃত্যু বরণ করেন আর সেই মসজিদও তালাবদ্ধ হয়ে যায়। তখন এটি দেখাশোনার কেউ ছিল না। অতঃপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র যুগে খাজা কামাল উদ্দীন সাহেব এখানে আসেন। তিনি এই মসজিদটি খোলানোর চেষ্টা করেন এবং সফল হন। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে লেখেন, এখন এই মসজিদের একটি ট্রাস্ট গঠিত হয়েছে যার তত্ত্বাবধায়ক আমাকে বানানো হয়েছে আর এরপর পুনরায় এখানে ইবাদত আরম্ভ হয়েছে। যখন এটি খোলা হয়েছিল তখন খাজা কামাল উদ্দীন সাহেবের সাথে চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবও সেই মসজিদে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি নফল নামায পড়েন এবং অনেক দোয়া করেন। এর স্বল্পকাল পর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মুবাল্লেগ প্রেরণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, কিন্তু অর্থের সংকুলান হচ্ছিল না। যাহোক কোনোভাবে চেষ্টা করে চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ সিইয়্যাল সাহেবকে এখানে প্রেরণ করা হয়। তিনি খাজা সাহেবের সাথে কিছুদিন কাজ করেন। অতঃপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র মৃত্যুর পর খাজা সাহেব হযরত

খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র হাতে বয়আত না করার কারণে চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ সিইয়্যাল সাহেব তাকে পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। যাহোক এটি ছিল ওকিং-এর মসজিদ। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায় বা আহমদীয়া জামা'তের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল সেটি হলো ফযল মসজিদ। নিঃসন্দেহে বর্তমানে ইংল্যান্ডে, লন্ডনে এবং পশ্চিমা বিশ্বে মুসলমানদের অনেক মসজিদ রয়েছে, কিন্তু লন্ডনে প্রথম মসজিদ হওয়ার সম্মান ফযল মসজিদেরই রয়েছে। অন্যান্য যেসব মসজিদ রয়েছে সেগুলোও কিন্তু ইসলামের সেই সুন্দর শিক্ষা পৃথিবীতে অথবা পশ্চিমা বিশ্বে প্রচার করছে না যার মাধ্যমে প্রেমপ্রীতি, শান্তি-সন্ধি ও সংহতির বার্তা সবার কাছে পৌঁছে, যেমনটি কিনা আহমদীয়া জামা'তের মসজিদ থেকে প্রচারিত হচ্ছে। এটিও আল্লাহ্ তা'লার কৃপা যে, পশ্চিমা বিশ্বের অন্যান্য যেসব মসজিদ রয়েছে সেগুলো সরকারের সাহায্য নিয়ে– কতিপয় অমুসলিম সরকারের সাহায্য নিয়ে অথবা ক্ষেত্রবিশেষে কতিপয় মুসলমান সরকারও তাদের কিছু সাহায্য করেছে– এর মাধ্যমে সেগুলো নির্মাণ করা হয়েছে বা সেগুলোর ব্যয় নির্বাহ হচ্ছে। বরং এসব মসজিদ এখনও বিভিন্ন সরকারের তহবিলে পরিচালিত হয়। এখানে অর্থাৎ ইংল্যান্ডে মুসলমানদের যে–সব সংগঠন প্রতিষ্ঠিত আছে সেগুলো সরকারের পক্ষ থেকে সরকারি অনুদান পায়। কিন্তু আহমদীয়া জামা'ত কোনো সরকারি অনুদান নেয় না। আহমদীয়া জামা'তের বৈশিষ্ট্য হলো, জামা'তের মসজিদগুলো সদস্যদের চাঁদায় এবং কুরবানীর মাধ্যমে নির্মিত হয়। আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখন তো ইংল্যান্ডেও জামা'তের কুরবানীর মাধ্যমে বহু মসজিদ নির্মিত হয়েছে আর পশ্চিমা বিশ্বেও অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

যাহোক আজ ফযল মসজিদের বরাতেই আমি কিছু কথা উল্লেখ করতে চাই। আর এসব কথাকে গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টি তখন প্রতীয়মান হবে অথবা শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আমরা যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি তা তখন লাভজনক হবে যখন আমরা মসজিদের উদ্দেশ্য পূর্ণকারী হব, যা হলো এটিকে আবাদ করার (তথা নামাযী দিয়ে পূর্ণ রাখার) দায়িত্ব, নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির দায়িত্ব, আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উন্নতি করার দায়িত্ব, নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত করার দায়িত্ব। আমাদেরকে এসব ইসলামী দায়িত্ব পালন করতে হবে। অতএব প্রত্যেক আহমদীর একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, কেবল একটি অনুষ্ঠান করে অথবা আলোকসজ্জা করে আনন্দিত হয়ে যাবেন না। বরং এই মসজিদের দায়িত্বও পালন করুন। এর ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দিন এবং এই ইতিহাসের প্রতি অভিনিবেশ করুন, অতঃপর আত্মবিশ্লেষণ করুন। এই প্রেক্ষিতে মৌলিক যে কথাটি আমি সর্বপ্রথম বলতে চাই তা হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামের বিস্তৃতির ব্যাপারে অনেক কথা বলেছেন। এগুলোই আমাদের তবলীগি কর্মকাণ্ডের ভিত্তি। এক স্থানে পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামের প্রসার সম্পর্কে একটি স্বপ্নের প্রেক্ষিতে তিনি বলেন,

অনুরূপভাবে সূর্যোদয় যা পশ্চিম দিক থেকে হবে আর যার ওপর আমরা নিশ্চিতভাবে ঈমান রাখি, কিন্তু একটি স্বপ্নে এই অধমের কাছে যা প্রকাশ করা হয়েছে তা হলো, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যের উদয় হওয়ার অর্থ হলো, পশ্চিমা দেশসমূহ– যেগুলো প্রাচীনকাল থেকেই কুফর ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত– সেগুলোকে সত্যের সূর্য দ্বারা আলোকিত করা হবে আর তারা ইসলাম দ্বারা আশিসমণ্ডিত হবে।

তিনি দৃপ্তকণ্ঠে একথা বলেন। তাই আমাদের আশা রাখা উচিত যে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা এসব দেশেও ইসলাম বিস্তার লাভ করবে। এরপর তাঁর (আ.) আরো একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী রয়েছে। তিনি বলেন,

আমি (স্বপ্নে) দেখি যে, আমি লন্ডন শহরে একটি মিম্বরে দাঁড়িয়ে আছি আর ইংরেজী ভাষায় অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতার মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করছি। এরপর আমি বহু পাখি ধরি যেগুলো ছোটো ছোটো গাছে বসা ছিল আর সেগুলোর রঙ ছিল সাদা, আর হয়ত তিতির পাখির দেহের ন্যায় তাদের দেহাকৃতি হবে। অতএব আমি এর এই ব্যাখ্যা করি যে, আমি স্বয়ং না হলেও আমার রচনাবলি তাদের মাঝে বিস্তৃতি লাভ করবে আর বহু পুণ্যাত্মা ইংরেজ সত্যের শিকারে পরিণত হবে। প্রকৃত পক্ষে আজ পর্যন্ত পশ্চিমা দেশসমূহের ধর্মীয় সত্যের সাথে সম্পর্ক খুব কমই ছিল। যেন খোদা তা'লা ধর্মের বোধবুদ্ধির পুরোটা এশিয়াকে দিয়ে দিয়েছেন আর জাগতিক বোধবুদ্ধির পুরোটা ইউরোপ ও আমেরিকাকে। তিনি (আ.) বলেন, নবীদের (আগমনের) ধারাও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এশিয়ার অংশেই ছিল আর বেলায়েত তথা খোদার নৈকট্যের পরাকাষ্ঠাও এই লোকেরাই অর্জন করেছেন। এখন খোদা তা'লা এই লোকদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দিতে চান। অর্থাৎ পাশ্চাত্যের দেশগুলোর মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা করুণার দৃষ্টি দিতে চান।

অতএব, এটি হচ্ছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী, আকাঙ্ক্ষা, প্রার্থনা এবং সুসংবাদ। এটিই সেই কাজ যা অব্যাহত রাখার জন্য আজ আহমদীয়া জামা'ত ইংল্যান্ডেও এবং যুক্তরাজ্য ছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে (তথা) আমেরিকাতে এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশেও ইসলামের সত্যিকার বাণী প্রচার করছে। ফযল মসজিদের সূচনাও এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই করা হয়েছিল। যেমনটি আমি উল্লেখ করেছিলাম, প্রথমে খাজা কামাল উদ্দীন সাহেব **ওকিং**-এর মসজিদে এসেছিলেন। কিন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র ইন্তেকালের পর তিনি খিলাফতের আনুগত্য স্বীকার করেন নি। তাই চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ সিইয়্যাল সাহেব, যিনি তখন তার সাথে ছিলেন, তিনি তার সাথে একত্রে কাজ করতে সমস্যা বোধ করেন এবং তার থেকে পৃথক হয়ে অন্য এক স্থানে এসে আহমদীয়া জামা'তের তবলীগ বা প্রচারের কাজ আরম্ভ করেন, (আহমদীয়াতের) বাণী পৌঁছাতে থাকেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি সাফল্যও লাভ করেন। মোটকথা, আমরা বলতে পারি, চৌধুরী ফতেহ্ মুহাম্মদ সিইয়্যাল সাহেব হলেন (ইংল্যান্ডে) আহমদীয়া জামা'তের প্রথম মুবাল্লেগ; যিনি যথারীতি মুবাল্লেগ হিসেবে এখানে আসেন এবং সর্বপ্রথম ফলও তিনি লাভ করেন যার নাম ছিল **মিস্টার কোরিও**, যিনি একজন সাংবাদিক ছিলেন, তিনি মুসলমান হন এবং তার পরে এক ডজনের অধিক মানুষ আহমদী মুসলমান হন। চৌধুরী সাহেবের তবলীগের বেশিরভাগই ছিল বক্তৃতার মাধ্যমে। তিনি বিভিন্ন স্থানে গিয়ে, বিভিন্ন ক্লাব ও সভা-সমিতিতে গিয়ে বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে ইসলামের বাণী প্রচার করতেন। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ সিইয়্যাল সাহেবকে কাদিয়ানে ফেরত ডেকে পাঠিয়ে কাজী আব্দুল্লাহ্ সাহেবকে এখানে মুবাল্লেগ হিসেবে প্রেরণ করেন। তিনি এখানে কিছুদিন কাজ করেন। কাজী সাহেবও সাহাবী ছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তবলীগের কাজ খুবই কঠিন হয়ে পড়ে, তবুও তারা তবলীগের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। কাজী সাহেবের যুগে মিশনকে একটি স্থায়ী রূপ দেবার লক্ষ্যে **স্টার স্ট্রীটের** বাড়িটি ভাড়া নেওয়া হয়। এরপর ইতিহাসে এটিও লেখা আছে, কাজী সাহেবের এখানে অবস্থানকালেই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) হযরত মুফতী

মুহাম্মদ সাদেক সাহেবকে মুবাল্লেগ হিসেবে প্রেরণ করেন। তিনি ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত এখানে অবস্থান করেন। ১৯১৯ সনে পুনরায় চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ সিইয়্যাল সাহেব এবং মৌলভী আব্দুর রহীম নাইয়্যার সাহেবকে এখানে পাঠানো হয় এবং তারা দুজনেই নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেন এবং আহমদীয়াত প্রচার করেন। ১৯২০ সালে চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ সিইয়্যাল সাহেবকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র পক্ষ থেকে বলা হয়, ইংল্যান্ডে মসজিদ নির্মাণের জন্য কিছু জমি ক্রয় করুন যেন এখানে রীতিমতো একটি মিশন হাউস প্রতিষ্ঠা করে কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে। এজন্য চেষ্টা করা হয় এবং দুই হাজার দু–শো পাউন্ডের অধিক মূল্যে পাটনী এলাকায় এই জায়গাটি ক্রয় করা হয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যখন এ সংবাদ পান তখন তিনি ডালহৌসিতে ছিলেন। তিনি সেখানে একটি বড়ো অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং সেখানে এই মসজিদের নাম **'মসজিদ ফযল'** নির্ধারণ করেন। এরপর চাঁদার আহ্বান করা হয় যেন মসজিদ নির্মাণের জন্য বেশি বেশি অর্থ সংগ্রহ করা যায়। হযরত চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ সিইয়্যাল সাহেব একজন ইহুদীর কাছ থেকে এই জমিটি ক্রয় করেছিলেন। যেমনটি আমরা জানি, এখানে এখন নতুন (বিল্ডিং) নির্মিত হয়েছে; কিন্তু তখন (শুধু) একটি বাড়ি এবং প্রায় এক একরের মতো জমি ছিল। এরপর ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, পরবর্তীতে এই মসজিদের (কাজের) অগ্রগতি কীভাবে হয়েছিল, নির্মাণ কীভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। ১৯২৪ সনে ওয়েম্বলীর প্রদর্শনী চলাকালীন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির হৃদয়ে ধারণা জাগে যে, এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর পাশাপাশি পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মেরও একটি প্রদর্শনী করা উচিত এবং খ্রিষ্টধর্মকে বাদ দিয়ে– যার অবস্থা সম্বন্ধে পাশ্চাত্যবাসীরা স্বয়ং ভালোভাবে অবগত– অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করাতে হবে এবং তাদের প্রতিনিধিদের লন্ডনে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের দিয়ে বক্তৃতা করাতে হবে। এ-লক্ষ্যে তারা মৌলভী আব্দুল রহীম নাইয়্যার সাহেবকে আহমদীয়া জামা'তের পক্ষ থেকে বক্তব্য প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান, যিনি সেসময় এখানে মুবাল্লেগ ছিলেন। মওলানা নাইয়্যার সাহেব কাদিয়ানে (এই) সংবাদ পাঠান। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এই মর্মে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন যে, এখান থেকে কোনো প্রতিনিধি আমরা প্রেরণ করব, যিনি (সেখানে) ইসলামের উত্তম গুণাবলি উপস্থাপন করবেন। একইসাথে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) স্বয়ং একটি প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন, যাতে ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য বা গুণাবলি বর্ণনা করা হয় এবং সত্যিকার শিক্ষা বর্ণনা করা হয় আর এটি মোটা বইয়ের আকার ধারণ করে; অর্থাৎ বক্তৃতার উদ্দেশ্যে যা তিনি রচনা করে দিয়েছিলেন, যেটি **'আহমদীয়ত ইয়ানী হাকিকী ইসলাম'** (আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম) নামে (পুস্তক আকারে) এখন প্রকাশিতও হয়েছে। যাহোক, এরপর জামা'তের প্রতিনিধিদের একটি পরামর্শ সভা আহ্বান করা হয়, যাতে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এবং হযরত আব্দুর রহীম দর্দ সাহেব (রা.) প্রস্তাব দেন, এটি এমন এক সুবর্ণ সুযোগ, যাতে কোনো প্রতিনিধি প্রেরণ করার পরিবর্তে হযরত খলীফাতুল মসীহ্র স্বয়ং যাওয়া উচিত এবং তাঁর সাথে কয়েকজন সঙ্গীও যাওয়া উচিত। এরপর সিদ্ধান্ত হয়, তিনি (রা.) স্বয়ং ইংল্যান্ডে যাবেন; দামেশ্ক এবং মিশর হয়ে ইউরোপে পৌঁছবেন এবং নিজের সাথে কয়েকজন সফরসঙ্গী নিয়ে যাবেন, যাদের মাঝে চৌধুরী জাফর উল্লাহ্ খান সাহেব এবং হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবও ছিলেন। এই দুইজন অর্থাৎ হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব এবং চৌধুরী জাফর উল্লাহ্ খান সাহেব নিজেদের খরচে এখানে এসেছিলেন। একইভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-ও নিজের ব্যয়ভার নিজেই বহন করেছিলেন। যাহোক, হযরত

খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) দামেশ্ক ও মিশর হয়ে ইতালি, সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্সের পথ ধরে ইংল্যান্ডে পৌঁছেন। ১৯২৪ সনের ২২শে আগস্ট তিনি এখানে পৌঁছেন। একটি মজার বিষয় হলো, তাঁর এই শুভাগমন সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-কে পূর্বেই একটি স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল যে, তিনি ইংল্যান্ডের সমুদ্রতীরবর্তী কোনো এক স্থানে অবতরণ করেছেন এবং এক বিজয়ী সেনাপতির ন্যায় একটি কাষ্ঠখণ্ডে পা রেখে চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন। তখন একটি আওয়াজ আসে, **'উইলিয়াম দি কংকারার'**। যেন ইংল্যান্ডের আধ্যাত্মিক বিজয়ের বিষয়টি হুযূরের ইংল্যান্ডে আগমনের সাথে নির্ধারিত ছিল যা এখন প্রকাশিত হয়েছে।

পত্রপত্রিকা হুযূর (রা.)-র সফর এবং ইংল্যান্ডে পৌঁছার সংবাদ বেশ ফলাও করে প্রচার করে। তিনি (রা.) এখানে পৌঁছে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া স্টেশনে নামেন। (অর্থাৎ তিনি) সমুদ্র বন্দর থেকে ভিক্টোরিয়া যান। এখান থেকে তিনি (রা.) এবং তাঁর সফরসঙ্গীরা ইংল্যান্ডের সর্ববৃহৎ প্রসিদ্ধ সেইন্ট পল গির্জার সামনে এসে উপস্থিত হন। এই গির্জার সামনে দাঁড়িয়ে মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ তা'লার কাছে তিনি ইসলাম এবং তৌহীদের বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করেন। এরপর তিনি (রা.) তাঁর সফরসঙ্গীদের নিয়ে শহরে প্রবেশ করেন। তাঁর বাসস্থানের জন্য পূর্বেই একটি উত্তম স্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, বড়ো একটি বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। ধর্মীয় কনফারেন্সে বিভিন্ন প্রবন্ধ পাঠ, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ এবং সর্বসাধারণ্যে বিভিন্ন বক্তৃতা প্রদান এবং এরই মধ্যে কাবুল থেকে শহীদ নিয়ামত উল্লাহ্ খান সাহেবকে প্রস্তরাঘাতে শহীদ করে দেবার সংবাদও এসে পৌঁছে। এসব ঘটনাপ্রবাহের কারণে আহমদীয়া জামা'ত যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করে এবং অনেক সংবাদপত্রে এগুলো নিয়ে যথেষ্ট চর্চা হয়। যাহোক, এসব অনুষ্ঠান শেষে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর রাখার পালা আসে এবং এই কাজও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে এবং ভাবগাম্ভীর্যের সাথে সম্পন্ন হয়।

মসজিদের ব্যাপারে ইতিহাসে লেখা রয়েছে, যদিও ইংল্যান্ডে তবলীগের ধারা চালু হতেই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র হৃদয়ে মসজিদ নির্মাণের চিন্তার উদয় হয়েছিল। কেননা সেখানে বারংবার ঘর পরিবর্তনের কারণে তবলীগের প্রভাব মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। জামা'তের অবশ্যই একটি কেন্দ্র থাকা উচিত। ভাড়ায় ঘর নিলে ঠিকানা পরিবর্তনের কারণে ধারাবাহিকতা না থাকায় ততটা প্রভাব হচ্ছিল না। সেজন্য তিনি ভাবতেন, কেন্দ্র অবশ্যই থাকা উচিত। কিন্তু বাহ্যত এই কাজ দুরূহ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। এর কার্যত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ ১৯১৯ সাল পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। অর্থের যোগান এবং লন্ডনে পর্যাপ্ত জমি পাওয়া, আবার সে জমি ভদ্রলোকদের এলাকায় হওয়া এবং এমন হওয়া যেন আইনগতভাবে কোনো শর্ত বা বিধিনিষেধ না থাকে। এ বিষয়গুলো অর্থাৎ এ সমস্ত শর্ত পূরণ হওয়াটা লন্ডনের ঘরবাড়ি এবং জমি ক্রয় ও নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ভবণ নির্মাণ করার ক্ষেত্রে খুব কঠিন বাধা ছিল। এরপর এর নির্মাণ ও তদারকি, সর্বোপরি মানুষের মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করা– এসব এমন বিষয় যা এর পথে বাধা ছিল। কিন্তু খোদা প্রত্যেক ব্যবস্থাপনা সর্বোত্তম উপায়ে এবং সর্বোত্তমরূপে পূর্ণ করে দিয়েছেন। সর্বপ্রথম অর্থের যোগান ছিল; সেটা এভাবে পূরণ হলো: যুদ্ধ শেষ হবার পর একটা সময় আসলো যখন পাউন্ডের দরপতন হতে লাগল। যখন পাউন্ডের দর অনেক পড়ে গেল, তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র হৃদয়ে প্রবলভাবে এই সুযোগ লুফে নেবার প্রেরণা জাগে। তিনি এই সুযোগটিকে লুফে নিলেন এবং ৬ জানুয়ারী ১৯২০ তারিখে এই চিন্তা মাথায় নিয়ে যোহরের নামায পড়িয়ে ফেরত আসছিলেন। সেসময় কয়েকজন ব্যক্তি যারা দেরিতে এসেছিলেন তারা

নামায আদায় করছিলেন, যার কারণে পথ বন্ধ ছিল। তিনি থেমে গেলেন আর সেখানেই বসে পড়লেন এবং সেখানে বসে তিনি নাযের বায়তুল মালকে বললেন, এই সময় চৌদ্দো পনেরো হাজার রুপি ঋণ নিয়ে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। রুপি ভাঙালে বর্তমানে যেহেতু পাউন্ডের দর অনেক কম, তাই অনেক পাউন্ড পাওয়া যাবে। ঘরে ফেরত এসে তিনি এই তাহরীককে চূড়ান্ত রূপ দিলেন। নাযের বায়তুল মালও লিখে দিয়েছিলেন, সেটা তিনি (রা.) ঠিক করলেন। চৌদ্দো পনেরো হাজারের বদলে ত্রিশ হাজার রুপি তিনি লিখে দিলেন। তিনি প্রথমে বলেছিলেন ঋণ, কিন্তু তিনি চাঁদা শব্দটি লিখে দিলেন। হুযূর (রা.) বলতেন, অবলীলায় যেন এমন হয়ে গেল। এটি লিখে সেদিন আসরের সময় তিনি নাযের বায়তুল মালকে দিয়ে দিলেন। তিনি তাকে বললেন, এর জন্য মাগরিবের পর লোকদের একত্রিত করা হোক। মসজিদ মোবারকে জায়গা কম ছিল এবং এলানের জন্য সময়ও কম ছিল, তবুও হুযূরের এই প্রথমবার আহ্বানের সময় ছয় হাজার রুপি চাঁদা জমা হলো। দ্বিতীয় দিন মহিলাদের মাঝে আহ্বান জানানো হলো, আর সেদিন আসরের সময় পুরুষদের মাঝে মসজিদ আকসাতে দ্বিতীয়বার এবং পরিশেষে ৯ জানুয়ারি ১৯২০ জুমআর দিন খুতবায় সাধারণ ঘোষণা দেওয়া হলো। এভাবে ১০-১২ জানুয়ারি পর্যন্ত শুধুমাত্র কাদিয়ানের চাঁদা বারো হাজার রুপিতে উপনীত হয়। কাদিয়ানের এই অভাবী জামা'ত অনেক বড়ো ত্যাগ স্বীকার করে এই চাঁদা একত্রিত করল। হুযূর (রা.) বললেন, এই দরিদ্র জামা'তের এই পরিমাণ চাঁদা আদায় করা বিশেষ ঐশী সাহায্য ব্যতীত সম্ভব ছিল না। আমি মনে করি, আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ এই সময় চাঁদার সাথে রয়েছে। তিনি বলেন, মানুষের আবেগ-উচ্ছ্বাস দেখার মতো ছিল এবং এটা তারাই অনুধাবন করতে পারবেন যারা এটা নিজ চোখে দেখেছেন। সব নারী-পুরুষ ত্যাগের স্পৃহায় যেন নেশায় মত্ত হয়ে চাঁদা দিচ্ছিল। এক বালক যে এক দরিদ্র কিন্তু পরিশ্রমী ব্যক্তির সন্তান ছিল– সে বলে, আমি সাড়ে তেরো রুপি জড়ো করেছি। সে যুগে সাড়ে তেরো রুপির কিছু না কিছু মূল্য ছিল। যে দরপতন হয়েছিল সে অনুযায়ী এক বা দেড় পাউন্ড তো হবেই। যাহোক সে বলে, সাড়ে তেরো রুপি জমিয়েছি এবং চাঁদা হিসেবে প্রেরণ করছি। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, জানা নাই– কত আশা ও বাসনা নিয়ে এই বালক সেই টাকা জমিয়েছিল! কিন্তু ধর্মীয় চেতনায় খোদার পথে সেই টাকার সাথে সেই বাসনাগুলোকেও জলাঞ্জলি দিয়েছে। যাহোক এই কুরবানীতে মানুষ বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ করতে থাকে। তারপর তিনি (রা.) গুরদাসপুর, লাহোর প্রভৃতি বাইরের জেলাগুলোতে তাহরীক করেন আর ধারণা ছিল ত্রিশ হাজার রুপি এই তিন জেলা থেকেই পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর তিনি (রা.) আরো বলেন, আমার ভয় হলো- অন্যান্য জামা'তগুলো আবার না অনুযোগ করে বসে তাই আমি এর (পরিধি) আরো বিস্তৃত করলাম আর টাকার পরিমাণও বৃদ্ধি করে এক লক্ষ করলাম, যেন লোকেরা পুণ্যে অংশগ্রহণ করতে পারে। বরং এক ব্যক্তি হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-কে এটি লেখেন, দোয়া করুন, আমি কোনো একটি ব্যবসা করছি; খোদা তা'লা যেন আমাকে আমার উদ্দেশ্যে সফলতা দান করেন (আর) এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমি ইংল্যান্ডে আহমদীয়া মসজিদ তৈরি করতে যা খরচ হবে– সব খরচ নিজে বহন করব। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, আমি এর অনুমতি দেই নি, কেননা কাউকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছিলাম না। যাহোক এই টাকা জমা হওয়া আরম্ভ হয়। টাকা জমা হলে ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার মাধ্যমে ইংল্যান্ডে প্রেরণ করা হয়, যা তিন হাজার চারশ আটষট্টি পাউন্ড হয়। বর্তমান সময়ের এবং সেই যুগের অবস্থার কথা একটু অনুমান করুন। রুপিতে বায়ান্ন হাজার রুপি হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে এই অর্থ জমা হয়। পরবর্তীতে

আরো অর্থ প্রেরণ করা হয়। আবার সেই দিনগুলোতে দ্বিতীয়বার পাউন্ডের দরপতন হয় যার ফলে স্বল্প রুপিতে অধিক পাউন্ড পাওয়া যায়। পনেরো রুপি থেকে প্রতি পাউন্ড ছয় রুপিতে নেমে আসে।

যাহোক যেমনটি আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র এখানে আগমনের ফলে এই মসজিদের নির্মাণকাজ ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কার্যক্রমের সূচনা হয়।

১৯২৪ সালের ১৯ অক্টোবর রবিবার দিন এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ইতিহাসে লেখা আছে, ১৯২৪ সালের ১৮ অক্টোবরের দৈনিক পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, ১৯ অক্টোবরের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছিল, আবহাওয়া চমৎকার থাকবে এবং সূর্য বের হবে। কিন্তু খোদা তা'লা এই পূর্বাভাসকে ভুল প্রমাণিত করেছেন এবং নিজ অস্তিত্বের স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন। সকাল থেকে বৃষ্টি শুরু হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র সামনে এই বিষয়টি উপস্থাপন করা হলে তিনি বলেন, বিচলিত হওয়ার কী আছে? অনেক ভালো হয়েছে! এমন অবস্থায় উদ্‌বোধনের জন্য যারা আসবেন তারা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথেই আসবেন। আগামীকালও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এখন দেখুন এই পূর্বাভাস পূর্ণ হয় কিনা। যাহোক তিনি (রা.) বলেছেন, যারা আসবেন নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সাথেই আসবেন এবং ইনশাআল্লাহ্ এই অনুষ্ঠান সফল হবে। ছোটো তাঁবু খাটানো হয় যেন লোকেরা স্বচ্ছন্দে তাঁবুতে বসে অনুষ্ঠান দেখতে ও শুনতে পারেন। বিভিন্ন মানুষকে আমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করা হয়। (তাদের মাঝে) সংসদ সদস্য, নেতৃবৃন্দ, রাজনীতিবিদ, কূটনীতিবিদেরা ছিলেন। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সময় সল্প ছিল তাই ধারণা করা হয়েছিল, মানুষ অনেক কম হবেন। কিন্তু তারপরও বহু সংখ্যক অতিথি আগমন করেন। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গ অংশ নেন। এই অনুষ্ঠান সকল দিক থেকে সফল হয়। সেই অনুষ্ঠানের সময় যে-স্থানে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার কথা, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) সেখানে দণ্ডায়মান হন। তিনি (রা.) দাঁড়ানোর পর হযরত হাফেয রওশন আলী সাহেব (রা.) সূরা লাইল এবং সূরা আ'লা এই দুটি সূরা পাঠ করেন। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি (রা.) বলেন, আজ আমরা এমন এক কাজের জন্য সমবেত হয়েছি যা নিজ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা; অর্থাৎ এমন এক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য যা কেবলমাত্র সেই মহান অস্তিত্বকে স্মরণ করা এবং তাঁর সমীপে নিজ দাসত্বের বহিঃপ্রকাশের জন্য বানানো হয়, যে মহান অস্তিত্ব সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। সে যে-দেশেরই অধিবাসী হোক বা যে-কোনো সরকারে অধীনেই বসবাসকারী হোক অথবা যে-কোন ভাষাভাষীই হোক না কেন, সেখানে গিয়ে এক হয়ে যায়। সেই সত্তা এমন এক কেন্দ্রবিন্দু যাঁর সমীপে সমগ্র মানবকুল, বড়ো-ছোটো, কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ অথবা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের কোনো পার্থক্য থাকে না। কেননা মানুষ যতই তাঁর নিকটবর্তী হয়, ততই মানুষের মাঝে মতভেদ দূর হতে থাকে এবং ঐক্য দৃঢ়তর হতে থাকে। অতএব যে ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য আমরা আজ একত্রিত হয়েছি সেই ভবন একতা ও সাম্যের একটি প্রতীক আর নিজ অস্তিত্বের মাধ্যমে আমাদেরকে এ দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করছে যে, আমাদের আগমন ও প্রত্যাবর্তস্থল এক। অতএব আমাদের পারস্পরিক মতবিরোধের কারণে একে অপরের সাথে সংঘাত করা এবং বিশৃঙ্খলা করা উচিত নয়।

এরপর তিনি (রা.) এ-ও বলেন, মতানৈক্য তো হতেই থাকে আর মতানৈক্য তো জগতের এমন কোনো বিষয় না যে, মতানৈক্য হবে না; এটি তো ভালো বিষয়। বরং মহানবী (সা.) বলেন, মতানৈক্য আশির্বাদের চিহ্ন হয়ে থাকে; এটি ক্ষতি করে না। কিন্তু যে বিষয়টি মন্দ তা হলো অসহিষ্ণুতা। যদি মতানৈক্য হয়ে যায় আর সহ্য না হয়, অর্থাৎ অন্যকে সহমত

করার সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ প্রত্যেকে যখন চায় যে, আমি যা বলছি, তার সাথে একমত পোষণ করা হোক; কোনো মতানৈক্য যেন না করা হয় বরং সবাই যেন সহমত পোষণ করে– এমনটি হওয়া উচিত নয়। বরং মতানৈক্যও উন্নতির চিহ্ন। এ বিষয়টি যদি মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে সফলতা খুব সন্নিকটে এসে যায়।

এরপর তিনি (রা.) এ-ও বলেন, মানুষের মাঝে সহিষ্ণুতার শক্তি থাকা উচিত। মানুষজন বলে, মতানৈক্য মন্দ বিষয়। মতানৈক্য যদি মন্দ বিষয় হয়ে থাকে তাহলে সহিষ্ণুতার অর্থ কী? সহিষ্ণুতা তখন প্রমাণিত হয় যখন মতানৈক্য হবে। মতভেদ হলে মানুষ যেন সহ্য করে এবং অন্যায়ভাবে কাউকে কোনোপ্রকার ক্ষতিসাধনের চেষ্টা না করে। অতএব এ বিষয়টি সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত।

তিনি (রা.) বলেন, অতএব যে বিষয়টি জগতের প্রয়োজন তা হলো (পরমত) সহিষ্ণুতা, অর্থাৎ মানুষ ভিন্ন বিশ্বাস এবং ভিন্ন নীতিতে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও একে অপরের সাথে যেন সৌহার্দ্য ও ভালোবাসার সাথে বসবাস করে। নিঃসন্দেহে প্রত্যেক মানুষ অন্যকে সেই বিষয়ের দিকে আহ্বান করার অধিকার রাখে যেটিকে সে নিজের জন্য ভালো মনে করে, কেননা তবলীগ ছাড়া জ্ঞানের বিকাশ হতে পারে না। কিন্তু যে বিষয়ের কারো কোনো অধিকার নেই তা হলো, অন্যের হৃদয় পরিবর্তন করার পূর্বে তার ভাষা এবং তার আমল পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে অথবা কতিপয় বিষয়ে তার সাথে মতানৈক্য রাখার কারণে তাকে কষ্ট দেবার চেষ্টা করবে। এটি অন্যায় কাজ, অর্থাৎ বলপ্রয়োগ করে ভাষা আর আমল পরিবর্তন করা। হৃদয় পরিবর্তন করা উচিত। যদি বলপ্রয়োগ করা হয় তাহলে এটি অন্যায়।

এরপর তিনি (রা.) এ-ও বলেন, মসজিদ এরূপ চেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয় আর ইসলাম মসজিদের নাম রেখেছে বায়তুল্লাহ্ তথা এমন ঘর যেখানে মানুষের এই অধিকার নেই যে, সে পারস্পরিক মতানৈক্যের কারণে সেখান থেকে কাউকে বের করে দেবে অথবা কাউকে কষ্ট দেবে। কেননা এটি তার ঘর নয় বরং খোদার ঘর। কিন্তু পাকিস্তানী মোল্লারা বর্তমানে মনে করে যে, এটি তাদের অধিকার, তারাা যা খুশি বলতে পারে আর আহমদীদের মসজিদে যাওয়া অসম্ভব করে তোলা হয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, এটি কোনো মানুষের ঘর নয় বরং এটি খোদার ঘর। তিনি যেভাবে তার শত্রুর খোদা, একইভাবে তারও খোদা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ (সূরা বাকারা: ১১৫)

অর্থাৎ সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক যালেম আর কে আছে যে আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে নির্মিত ঘরে যেতে মানুষজনকে বাধা প্রদান করে এবং তাঁর ইবাদাত করতে বাধা দেয়?

পাকিস্তানী মোল্লারা বর্তমানে এই যুলুম করছে ইসলামের নাম ব্যবহার করে। যাহোক তিনি (রা.) বলেন, ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, মহানবী (সা.)-এর কাছে একদা ইয়েমেনের একটি খ্রিষ্টান প্রতিনিধিদল আসে। তাঁর (সা.) সাথে তারা কথা বলছিল, এমতাবস্থায় নামাযের সময় হয়ে যায়। তখন তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে বাইরে গিয়ে নামায আদায় করার অনুমতি চায়। মহানবী (সা.) বলেন, বাইরে গিয়ে নামায পড়ার প্রয়োজন নেই, আমাদের মসজিদেই নামায পড়ে নিন। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ এবং মহানবী (সা.)-এর ব্যবহারিক আচরণ দ্বারা এটি প্রমাণিত যে, ইসলামী মসজিদের দরজা প্রত্যেক সেই ব্যক্তির জন্য উন্মুক্ত যে খোদা তা'লার ইবাদত করতে চায়, আর ইসলামী মসজিদসমূহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে একত্রিত করারও একটি কেন্দ্রবিন্দু।

এরপর তিনি (রা.) এটিও বলেন, সেই চেতনা ও উদ্দীপনার সাথে যা বর্ণনা করা হয়েছে, আমরা অর্থাৎ জামা'তে আহমদীয়ার সদস্যরা উক্ত মসজিদ নির্মাণের সংকল্প করেছি এবং এর আজ আমি উদ্‌বোধন করছি। আমি এর ভিত্তিপ্রস্তর রাখার পূর্বে এ বিষয়ের ঘোষণা দিতে চাই, মসজিদ কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের জন্য নির্মাণ করা হয় যেন পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মানুষ যেন ধর্মের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে যা ব্যতিরেকে প্রকৃত শান্তি এবং প্রকৃত উন্নতি স্থাপিত হতে পারে না। আর যে ব্যক্তি খোদা তা'লার ইবাদাত করতে চায়, এমন কোনো ব্যক্তিকে আমরা কখনো ইবাদত করতে বাধা দেবো না। তবে হ্যাঁ, তার উচিত সকল নিয়মকানুন মেনে চলা যা এর ব্যবস্থাপকরা নির্ধারণ করবেন এবং তাদের ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি না করা যারা নিজেদের ধর্মীয় প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য এই মসজিদ নির্মাণ করেছে। আমি বিশ্বাস করি, পরস্পর সহনশীলতার চেতনা যা এই মসজিদের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হবে তা জগৎ থেকে নৈরাজ্য দূর করার এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। সেই দিন অচিরেই আসবে যখন মানুষ যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ করে প্রেম-ভালোবাসার সাথে পরস্পর সহাবস্থান করবে এবং সমস্ত বিশ্ব এ বিষয়টি অনুধাবন করবে যে, যে–ক্ষেত্রে সকল মানুষের স্রষ্টা একজনই সেক্ষেত্রে তাদের উচিত, পরস্পর ভাই-বোনের চেয়ে অধিক প্রেম-প্রীতির সাথে সহাবস্থান করা। একে অপরের উন্নতিতে প্রতিবন্ধক হওয়ার পরিবর্তে পরস্পরের উন্নতির ক্ষেত্রে সহায়ক হওয়া উচিত। কেননা যেভাবে কোনো পিতা তার সন্তানদের নিজেদের মাঝে ঝগড়াবিবাদ পছন্দ করেন না, অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লাও তাঁর সৃষ্ট মানুষের পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকা পছন্দ করেন না।

এরপর তিনি (রা.) বলেন, এক স্রষ্টা থেকে দূরে থাকার কারণে পরস্পরের মাঝে যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দেয়; (তা দূর করার জন্যই) আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে অর্থাৎ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতাকে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা থেকে দূরে সরে যাবার কারণেই যুদ্ধবিগ্রহ হয় আর সবাইকে একত্রিত করার জন্য এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন যেন তিনি (আ.) মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার দিকে মনোযোগী করেন, আর পারস্পরিক মতভেদ দূর করেন এবং পারস্পরিক ঐক্য ও ভালোবাসা সৃষ্টি করেন। অতএব আল্লাহ্‌র কৃপায় আহমদীয়া জামা'ত এই সমস্ত বর্ণগত যুদ্ধ এবং রাজনৈতিক যুদ্ধ দূরীভূত করতে সদা সচেষ্ট থাকবে। আমরা আশা করি, প্রত্যেক দেশের বিভিন্ন ধর্মের যারা পুণ্যাত্মা আছেন তারা এই প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সহায়ক হবেন, যেন শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। তিনি (রা.) বলেন, এর লক্ষণও আমরা দেখতে পাচ্ছি; যেমন এখন বিভিন্ন জাতির সম্মানিত ব্যক্তিরা আজকের এই সভায় উপস্থিত আছেন; (সেখানে বিভিন্ন ধর্মের সম্মানিত ব্যক্তিরা এসেছিলেন)। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আমরা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছি। আজ শতবছর পর এই যুগেও আমরা এটিই দেখছি যে, আজও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন জাতির নানান শ্রেণিপেশার মানুষ যখন এখানে আসেন তখন তারা বলেন, আহমদীয়া জামা'তের প্ল্যাটফরমে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাই। এখানে যারা ফযল মসজিদে যাতায়াত করেন, মসজিদ ফযলে নামায আদায় করে থাকেন– আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) একটি ফলক লাগিয়েছিলেন যার ওপর একথা লেখা আছে:

আমি মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আস-সানী, আহমদীয়া জামা'তের ইমাম– যার কেন্দ্র ভারতের পাঞ্জাবের কাদিয়ানে অবস্থিত; আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং ইংল্যান্ডে আল্লাহ্‌র ধ্বনি সমুচ্চ করার মানসে আর ইংল্যান্ডের জনগণ

যেন সেই কল্যাণ থেকে লাভবান হয় যা আমরা পেয়েছি– আজ ২০ রবিউল আউয়াল ১৩৪৩ হিজরীতে এই মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করছি। অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'লার দরবারে এ প্রার্থনা করি, তিনি আহমদীয়া জামা'তের নারী–পুরুষদের এই আন্তরিক প্রচেষ্টা কবুল করুন, এই মসজিদ আবাদ করার উপকরণ সৃষ্টি করুন আর সর্বদা এই মসজিদকে পুণ্য, তাকওয়া, ন্যায় এবং ভালোবাসার স্পৃহা ছড়িয়ে দেবার কেন্দ্রে পরিণত করুন। এছাড়া এ স্থান যেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা খাতামান নাবিয়্যীন (সা.) এবং মসীহ্ মওউদ নবীউল্লাহ্ বুরূয ও নায়েবে মুহাম্মদ হযরত আহমদ (আ.)-এর জ্যোতির্ময় রশ্মিমালা এ দেশে ও অন্যান্য দেশে বিকিরণের নিমিত্তে আধ্যাত্মিক সূর্যের ভূমিকা পালন করুক। হে খোদা! তুমি এমনটিই কোরো। ১৯ অক্টোবর ১৯২৪।

এই কথাগুলো সেখানে লেখা আছে, যা আপনারা হয়ত পড়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এসব দোয়ার মাধ্যমে এই 'মসজিদ ফযল'-এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এর বহুল প্রচারও করেছিল এবং হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-র বক্তৃতার বিভিন্ন অংশও তাদের পত্রিকায় ছাপিয়েছে ও জামা'তের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। আমি তাঁর বক্তৃতা থেকে যে–সব অংশ উল্লেখ করেছি, তা সংক্ষিপ্তভাবে করেছি; অনেক বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। যাহোক, যারা পড়তে আগ্রহী তারা মূল অংশ থেকে পড়তে পারেন।

পরিশেষে এই মসজিদ নির্মিত হয় এবং দুই বছর পর ১৯২৬ সালে এর উদ্‌বোধন হয়। এর উদ্‌বোধন করতে শাহ ফয়সালের আসার কথা ছিল, যিনি রাজপুত্র ছিলেন। তার পিতা বলেছিলেন, যাও; আর তিনি আসার অনুমতিও পেয়েছিলেন। কিন্তু মুসলমানদের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কারণে বাদশা তাকে বাধা দেন। অতঃপর শেখ আব্দুল কাদের সাহেব এর উদ্‌বোধন করেন আর তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেন, আমি আহমদী নই, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা ইসলামের সেবা করতে চাই। তাই আমাদের উচিত এই পার্থক্যের উর্ধ্বে গিয়ে আমাদের একে অপরকে সাহায্য করা। যাহোক, এটি তার সৎসাহস ও হৃদয়ের উন্মুক্ততার প্রমাণ– যার বহিঃপ্রকাশ তিনি ঘটিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও এর প্রতিদান দিন।

সর্বোপরি এই ছিল মসজিদ ফযলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। আর পশ্চিমে ইসলাম প্রচারই ছিল এ মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য। অতএব আজ যেমনটি আমি আপনাদের বলেছি, আমরা শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠান করছি। এ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য জাগতিক নয়, বরং হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী ও উদ্ধৃতি থেকে আমি যেভাবে উল্লেখ করেছি, এ মসজিদ তো সেই স্থান যেখানে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের উদ্দেশ্যে মানুষ একত্রিত হবে, এক খোদার ইবাদত করবে এবং একে অপরের অধিকার আদায়কারী হবে। তারা নিজেদের আধ্যাত্মিক সংশোধন করবে এবং নিজেদের নৈতিক চরিত্র উন্নত করবে। এ যুগে মানুষ আল্লাহ্‌কে ভুলে যাচ্ছে, তাই মসজিদের গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষানুযায়ী মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো ইবাদত, আর এ থেকেই আমরা দূরে সরে যাচ্ছি। অতএব বর্তমানে আমাদের এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত যেন আমরা ইবাদতের সঠিক মান বজায় রাখতে পারি আর নিজ গণ্ডিতে, নিজের চারপাশের মানুষজনকে এবং নিজের সন্তানসন্ততিকেও এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করি যে, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করার মাঝেই আমাদের প্রকৃত জীবন ও মুক্তি নিহিত। অধিকন্তু আমরা যেন তাঁর অধিকার আদায় করি, তাঁর সৃষ্টির অধিকার আদায় করি এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মান্য করে চলি। তবেই আমরা শান্তি, সন্ধি ও সম্প্রীতির সাথে বিশ্বকে সফলভাবে পরিচালিত করতে সক্ষম হবো এবং এখানে বসবাস করতে পারব। অন্যথায় এখানে নৈরাজ্য এবং

ঝগড়াবিবাদ ছাড়া আর কিছুই নেই, যার দৃষ্টান্ত বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। অতএব এই উদ্দেশ্যকে প্রত্যেক আহমদীর স্মরণ রাখতে হবে। মহানবী (সা.) বলেছেন, নিজের জন্য যা পছন্দ করো তা অপরের জন্যও পছন্দ করো। এই শিক্ষার আলোকে প্রত্যেক আহমদীর ওপর দায়িত্ব বর্তায়, সে যেন এই প্রচার ও এই বার্তা– যা ইসলামের প্রেমপ্রীতি এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানের শিক্ষা, শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা– তা দুনিয়াকে জানায়, দুনিয়াকে এর সাথে পরিচিত করিয়ে দেয় আর এর বিস্তার ঘটায়। কেননা এটিই মানুষের বেঁচে থাকার একমাত্র নিশ্চয়তা এবং এছাড়া আর কোনো পথ নেই। অন্যথায় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধ্বংসের অতল গহ্বরে পতিত হতে থাকবে। এসব যুদ্ধের কারণে ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণকারী প্রজন্ম প্রতিবন্ধী, পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মগ্রহণ করার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকেও মানুষকে সতর্ক করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এই মসজিদের অধিকার আদায়কারী হবার সামর্থ্য দান করুন এবং (এর পাশাপাশি) আমরা যেন প্রত্যেক মসজিদের অধিকার আদায়কারী হতে পারি। শুধু এই মসজিদই নয় বরং প্রত্যেক আহমদীর উচিত, তারা যেন প্রত্যেক স্থানে, প্রতিটি মসজিদকে আবাদ করতে এবং এর অধিকার আদায় করতে সচেষ্ট হয়। প্রত্যেক আহমদী নিজেদের ইবাদতের দায়িত্ব পালনকারী হবে, আল্লাহ্ তা'লার বাণী প্রচারের দায়িত্বপালনকারী হবে এবং ইসলাম প্রচারকারী হবে– এটিই প্রত্যাশা। সত্যিকার অর্থে যেন আমরা তেমন মুসলমান হয়ে যাই যে–জন্য আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে প্রেরণ করেছেন এবং এ যুগে তাঁর নিষ্ঠাবান সেবককে প্রেরণ করেছেন যেন ইসলামের পুনর্বাসন ও পুনর্জাগরণ পুনরায় শুরু হয় আর পৃথিবীতে ইসলাম ও এক অদ্বিতীয় খোদার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অধিকন্তু মহানবী (সা.)-এর পতাকা সারা বিশ্বে উড্ডীন হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)